ইসলামের আলোকে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলার গাইডলাইন

পজিটিভ মাইন্ডসেট

সফল জীবনের চাবিকাঠি

ইফতেখার সিফাত

সিজদাহ
পা ব লি কে শ ন
শব্দের বুননে উম্মাহ বিনির্মাণ

ভূমিকা

শক্তিশালী জাতি তো তারাই, যারা মানুষ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। যারা উন্নত গুণাবলি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চিন্তার ভেতরে ইতিবাচক ধারণা রোপণের মাধ্যমে শক্ত ও ইতিবাচক মনন গড়ে তোলে। এই রোপিত চারাটিই ধীরে ধীরে আচরণ, অভ্যাস ও দক্ষতায় রূপ নেয়। আর এভাবেই পরিবর্তন, গঠন ও প্রভাবের মধ্য দিয়ে একটি ইতিবাচক সমাজ ও পরিবেশ তৈরি হয়।

প্রতিটি মানুষ নিজের ভেতরে পজিটিভ মাইন্ডসেট গড়ে তোলার দায়িত্ব বহন করে। যাতে সে আরও সুখী ও মানসিকভাবে আরও সুস্থ থাকতে পারে। যদি বাবা-মা, সন্তান, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষক সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে আশপাশের মানুষদের সঙ্গে ইতিবাচক এপ্রোচ বজায় রাখেন, তাহলে তারা অন্যদের মধ্যেও ইতিবাচক মনোভাব ও মানসিক সুস্থতা ছড়িয়ে দিতে পারেন। এতে সমাজে ছড়িয়ে পড়বে সুখ ও সুস্থতা।

মানুষই হলো সেই সূচনাবিন্দু, যেখান থেকে আমরা সভ্যতা গড়ি, আলোকিত উম্মাহ নির্মাণ করি, পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই। এই জায়গা থেকেই মানুষের ভেতরে ইতিবাচক সত্তা গড়ে তোলার যাত্রা শুরু হয়। ইতিবাচকতা (Positivity) একটি বিস্তৃত ধারণা। এর ভেতরে বহু অর্থ ও বহু মাত্রা নিহিত আছে।

ইতিবাচকতার বিপরীত হলো নেতিবাচকতা। নেতিবাচকতা মানে হতাশা, ব্যর্থতার ভয়, অলসতা, অজ্ঞতা, দুর্বলতা, নিজের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়া, শুধু চাওয়া-পাওয়ার পেছনে ছোটা। লক্ষ্যহীন জীবন, কেবল ভোগের খোঁজ, সমাজ, ভাগ্য ও পরিস্থিতিকে সারাক্ষণ দোষারোপ করা। এসবই নেতিবাচকতার প্রকাশ।

নেতিবাচক মানুষের কথা, চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচরণ সবকিছুতেই হতাশা ও নৈরাশ্য ফুটে ওঠে। এগুলো আসলে তার ভেতরের কষ্ট, সংকীর্ণতা ও অশান্তিরই প্রতিফলন।

পক্ষান্তরে ইতিবাচকতা বলতে আমরা বুঝি, নিজের গণ্ডি ভেঙে বিস্তৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া। একজন মুমিনের ভেতরে নিজেকে ও সমাজকে সংশোধন করা, নিজের বাস্তবতাকে বদলানো এবং নিজের লক্ষ্য অর্জনের যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থাকে, সেটাই ইতিবাচকতার মূল প্রাণ।

ইতিবাচকতার মধ্যে রয়েছে ভালো চিন্তা, ইতিবাচক অনুভূতি, কল্যাণের প্রত্যাশা, জীবনের ভালো দিকগুলো দেখার মানসিকতা, আল্লাহর প্রতি ভরসা, সচেতনতা, মানসিক নমনীয়তা, দানশীলতা, সাহস, ধৈর্য, সরলতা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ সৃষ্টি করার দক্ষতা। পাশাপাশি উপকারী মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি অটল থাকা। এই কারণেই বলা হয়, ইতিবাচক মানুষ টক লেবু থেকেও মিষ্টি শরবত বানাতে পারে।

ইতিবাচক ব্যক্তি তার চিন্তা, অনুভূতি, কথা ও কাজ সবকিছুতেই সচেতনতা ও প্রজ্ঞার ছাপ রাখতে সক্ষম। সে ব্যর্থতা, সংকট ও কঠিন পরিস্থিতি পেরিয়ে যেতে জানে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসে আরও শক্ত হয়ে—নিজের জন্য, অন্যদের জন্যও। তার ভেতরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সে তার বাস্তবতা বদলাতে সক্ষম। সে সমস্যার মধ্যে আটকে না থেকে সমাধান ও বিকল্পের দিকে ফোকাস করতে সক্ষম। তার মাইন্ডসেট হয় বিকাশমুখী, উন্নত ও উৎপাদনশীল। সে কাজের ভেতরেই আশা দেখে, সম্ভাবনার দিকে তাকায় এবং ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'ইতিবাচক মানুষ প্রতিটি সমস্যার ভেতর সমাধান খুঁজে পায়, আর নেতিবাচক মানুষ প্রতিটি সমাধানের ভেতর সমস্যা দেখে।' ইতিবাচক ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তার পরিস্থিতি, সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নত করা সম্ভব এবং এগুলো তার নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। এর প্রভাব পড়ে তার আত্মিক প্রশান্তি, আত্ম-উপলব্ধি ও সুখের ওপর।

ইতিবাচকতার ভিত্তি আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাতেই পাই। তিনি বলেছেন, 'যদি কিয়ামত সংঘটিত হয় আর তোমাদের কারও হাতে

একটি চারাগাছ থাকে, তখন যদি সে তা রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা রোপণ করে।'[১]

এর অর্থ হলো, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, কাজ থেকে পিছিয়ে যাওয়া যাবে না; বাস্তবতাকে কাজে লাগাতে হবে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কল্যাণকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি, আমাদের ভেতরে যে গুণাবলি ও বিশ্বাস আমরা বহন করি, তা ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক, সবই আমাদের জীবন ও আচরণে প্রতিফলিত হয়। তাই নিজের ভেতরে ইতিবাচক গুণ, অর্থ ও ধারণা রোপণ করা জরুরি, যেন সেগুলো আমাদের ব্যক্তিত্ব ও বাস্তবতায় প্রকাশ পায়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

> 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' [সুরা রাদ, আয়াত ১১]

অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ভেতরের বিচ্যুতি, দুঃখ ও অস্থিরতাকে সুখ, প্রশান্তি ও শান্তিতে রূপান্তর করেন না, যতক্ষণ না আমরা নিজের ভেতরের ভুল বিশ্বাস, ধারণা, চিন্তা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাগুলো বদলাই। মানুষের ব্যক্তিত্বে সত্যিকারের পরিবর্তন শুরু হয় ভেতর থেকেই।

এক আরব জ্ঞানী বলেছেন, 'বাইরের জগতে কোনো শৃঙ্খলা নেই, সব শৃঙ্খলা থাকে ভেতরে। এই মহাবিশ্বে আপনি যে একমাত্র বিষয়টি বদলাতে পারেন, তা হলো আপনার নিজ সত্তা।'

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ.

> 'বরং মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সচেতন।'
>
> [সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ১৪]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১২৯৮১

অর্থাৎ মানুষ নিজের ব্যাপারে সচেতনতা ও উপলব্ধি রাখে এবং নিজের ওপর তার কর্তৃত্বও রয়েছে। এই সচেতনতা থেকেই সে নিজেকে বোঝার মাধ্যমে পরিবর্তনের পথে এগোয়।

একদিন এক শিষ্য এক জ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে সবাই আনন্দিত, শুধু আমি ছাড়া, কেন?' জ্ঞানী বললেন, 'কারণ তারা প্রতিটি বিষয়ের ভেতর ভালো ও সুন্দর দিক দেখতে শিখেছে।' শিষ্য বলল, 'আমি কেন সবকিছুর ভেতর ভালোটা দেখি না?'

জ্ঞানী উত্তর দিলেন, 'বাছা, যা তুমি নিজের ভেতরে দেখতে পারো না, তা বাইরেও দেখতে পারবে না।'

আসলে আমরা নিজের ভেতরে যা দেখতে অক্ষম, তা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। আমরা জীবন, মানুষ ও পরিস্থিতির সঙ্গে যেভাবে আচরণ করার সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের বাহিরটা সেটারই প্রতিফলন।

আমরা জীবন ও মানুষকে দেখি নিজের ভেতরের অবস্থা দিয়েই। তাই নিজের ভেতরে বিশৃঙ্খলা রেখে বাইরের দুনিয়া বদলাতে চাওয়া একটি অবাস্তব লক্ষ্য। আমাদের সর্বপ্রথম প্রকৃত ক্ষমতা যেটা আছে, তা হলো নিজেকে বদলানো, এরপরের ক্ষমতা হলো অন্যকে বদলানো। যখন আমরা নিজেকে বদলাই, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আশপাশের মানুষও প্রভাবিত হয় এবং তারাও ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে এগোয়। তখন অন্যকে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াটি আরও বেশি প্রভাবক ও ইতিবাচক হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ.

> 'হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।' [সুরা মায়েদা, আয়াত ১০৫]

অর্থাৎ প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হয় নিজের যত্ন নেওয়া থেকে। ভেতরের পরিশুদ্ধি, আন্তরিক দীনি প্রেরণা, সঠিক মানসিক ধারণা ও বিশ্বাস, এবং মানসিক, আত্মিক ও সামাজিক দক্ষতাগুলো বিকাশের মাধ্যমে, যাতে আপনি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই সুখী হতে পারেন।

একদল বিজ্ঞানী একবার একটি ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তারা ব্যাঙটিকে ফুটন্ত পানির পাত্রে রাখার পর দেখা যায়, ব্যাঙটি দ্রুত লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু পরে তারা ব্যাঙটিকে স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে রেখে ধীরে ধীরে তাপ বাড়াতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয়, ব্যাঙটি বের হওয়ার কোনো চেষ্টা না করেই পানির ভেতরে মারা যায়।

বিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যায় বলেন, ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্র হঠাৎ পরিবর্তনে সাড়া দেয়, কিন্তু ধীর ও দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনে সাড়া দেয় না। মানুষের অবস্থাও অনেকটা এমনই। যখন ভেতরে ধীরে ধীরে নেতিবাচকতা জমতে থাকে, আর মানুষ সেটা লক্ষ না করে, তখন একসময় দুঃখ, চাপ ও অস্থিরতা তাকে গ্রাস করে নেয়। তার চিন্তা করার ক্ষমতা ও দক্ষতা কমে যায়।

মূলত সচেতনতার আলো ভেতরের অন্ধকার দূর করে এবং মানুষকে ইতিবাচকতার পথে নিয়ে যায়। যখন হৃদয়ে ইতিবাচকতা দৃঢ় হতে থাকে, তখন জীবন ভরে ওঠে সুখ, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টিতে। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদের সকলেরই ইতিবাচক মাইন্ডসেট রাখা ও গড়ে তোলা দায়িত্ব। এই বইটি আপনার ইতিবাচক মাইন্ডসেট গড়ে তোলার পথে বাস্তবিকভাবেই সহায়ক হতে পারে ইনশাআল্লাহ।

বইটি মূলত সংকলনধর্মী প্রয়াস। ড. উসামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রচিত ‘ইজআলিল ইজাবিয়্যাতা সাজিয়্যাতান’, ড. ইবরাহিম আল ফিকহি রচিত ‘আত তাফকিরুস সালবিয়্যু ওয়াত তাফকিরুল ইজাবিয়্যু’ ও ড. সাঈদ বিন সালিহ আর রকিব রচিত ‘আত তাফকিরুল ইজাবিয়্যু ফি দওইস সুন্নাতিন নাবাউইয়্যাহ’ এর আলোকে সংকলন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ড. হিশাম আবদুল আজিজের বইপত্র থেকে ব্যাপক সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

কাজটি মার্জিতরূপে প্রকাশিত হওয়ার পেছনে কিছু মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন ও হুসাইন আহমাদ। আমি উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমাদের সকলের চেষ্টা কবুল করে নিন। এই বইটিকে মানুষের উপকারের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিন। আমিন।

সূচিপত্র

ইতিবাচক চিন্তার পরিচয় ১৯
ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব ২০
ইতিবাচক চিন্তার উপকারিতা ২৩
ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব ও আত্মপরিচয় গড়ে তোলা ২৬
ইতিবাচক প্রত্যাশা ও তার প্রভাব : সীরাতের দৃষ্টান্ত ২৮

ইতিবাচকতার তিন শক্তি ৩৩
সিদ্ধান্তের মৌলিক পাঁচটি ধরন আছে ৩৫

ইতিবাচক চিন্তার ধরন ৪৪
১. দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনজনিত ইতিবাচক চিন্তা। ৪৪
২. অন্যদের প্রভাবজনিত ইতিবাচক চিন্তা। ৪৬
৩. সময় সংশ্লিষ্ট ইতিবাচক চিন্তা। ৪৭
৪. দুঃখ বা কষ্টের সময়ে ইতিবাচক চিন্তা। ৪৭
৫. সময় অতিক্রমকারী চলমান ইতিবাচক চিন্তা। ৪৯
মুহাম্মাদ আলির ইতিবাচক চিন্তাধারা ও অদম্য মনোবল ৫০

পজিটিভ মাইন্ডসেটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

বৈশিষ্ট্য-১ : তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) ৫৩
তাওয়াক্কুলকে জীবনের অংশ বানাতে কার্যকর কিছু নির্দেশনা ৫৯

বৈশিষ্ট্য-২ : আত্মসচেতনতা (Self-Awareness) ৬২
আত্মসচেতনতার উপকারিতা ৬৬
আত্মসচেতনতা গড়ে তুলতে কয়েকটি বাস্তবসম্মত নির্দেশনা ৬৮

বৈশিষ্ট্য-৩ : অবচেতন মন (Subconscious Mind) ৭৫
সচেতন মন ও অবচেতন মনের পার্থক্য ৭৫
অবচেতন মন কীভাবে কাজ করে ৭৬
ঈগল ও মুরগির গল্প ৭৭
সামঞ্জস্যের নীতি ৭৮
অবচেতন মনকে ইতিবাচকভাবে প্রোগ্রাম করার গুরুত্ব ৭৮
কোন কোন উৎস থেকে অবচেতন মন প্রোগ্রাম হয়? ৭৯
অবচেতন মনকে ইতিবাচকভাবে প্রোগ্রাম করা ও ইতিবাচক বিশ্বাস গড়ে তোলার কিছু কার্যকর নির্দেশনা ৮২

বৈশিষ্ট-৪ : ইতিবাচক চিন্তা (Positive Thinking) ৮৭
ইতিবাচক চিন্তার প্রভাব ও মস্তিষ্কের পরিবর্তন ৯১
ইতিবাচক চিন্তার উপকারিতা ৯২
নেতিবাচক চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহারিক কিছু নির্দেশনা ৯৩

বৈশিষ্ট্য-৫: বংশগতি, পরিবেশ ও নির্বাচন ৯৬
নির্বাচনের শক্তি ব্যবহার করতে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ৯৯

বৈশিষ্ট্য-৬ : আত্মমর্যাদাবোধ ১০১
আত্মমূল্যবোধ গড়ে তুলতে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ১০৩

বৈশিষ্ট্য-৭ : আত্মবিশ্বাস (Self Confidence) ১০৬
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার বাস্তবিক কিছু নির্দেশনা ১০৯

বৈশিষ্ট্য-৮ : উদ্দীপনা ১১৪
উদ্দীপনার উপকারিতা ১১৫
উদ্দীপনা আসে কোথা থেকে? ১১৫
উদ্দীপনা গড়ে তুলতে ব্যবহারিক কিছু নির্দেশনা ১১৭

বৈশিষ্ট্য-৯ : সিদ্ধান্তগ্রহণ ১২২
সিদ্ধান্ত কী? ১২২
ভাগ্য বা 'লাক' (Luck) আসলে কী? ১২৩
সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা অর্জনে কার্যকর কিছু নির্দেশনা ১২৫

বৈশিষ্ট্য-১০ : অভ্যাস ১৩০
নেতিবাচক অভ্যাস ১৩১
ইতিবাচক অভ্যাস ১৩২
ইতিবাচক অভ্যাস গঠনে কার্যকর কিছু নির্দেশনা ১৩৩

বৈশিষ্ট্য-১১ : উদ্যোগ বা প্রো-অ্যাক্টিভিটি ১৪২
উদ্যোগকে গুণ, অভ্যাস ও চরিত্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বাস্তবমুখী কিছু নির্দেশনা ১৪৬

বৈশিষ্ট্য-১২ : সাহস ১৫১
ভীতু মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য ১৫৩
সাহস অর্জনের উপকারিতা ১৫৪
সাহস অর্জন করার কিছু কার্যকর নির্দেশনা ১৫৫

বৈশিষ্ট্য-১৩ : ক্ষমা (Forgiveness) ১৫৯
ক্ষমার বিভিন্ন ধরন ১৬০
ক্ষমাশীলতা অর্জনের কিছু বাস্তবিক নির্দেশনা ১৬১
ক্ষমার চারটি ধাপ ১৬৩

বৈশিষ্ট্য-১৪ : উচ্চাকাঙ্ক্ষা (Ambition) ১৬৪
উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের বৈশিষ্ট্য ১৬৬
উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলার কিছু নির্দেশনা ১৬৭

বৈশিষ্ট্য-১৫ : সক্ষমতার ব্যবহার ১৭০
একটি সুন্দর প্রতিভার গল্প ১৭১
গল্পের শিক্ষা ১৭২
সক্ষমতা কাজে লাগানোর ব্যবহারিক কিছু নির্দেশনা ১৭৩

বৈশিষ্ট্য-১৬ : স্বাধীন চিত্ত বা স্বনির্ভরতা ১৭৬
স্বাধীনতা বা আত্মনির্ভরতার ধরন ১৭৯
বাস্তব জীবনে আত্মনির্ভরতা অর্জনের কিছু নির্দেশনা ১৮০

বৈশিষ্ট্য-১৭ : নমনীয়তা (Flexibility) ১৮২
নমনীয় মানুষের অভ্যাস ১৮৩
জীবনে নমনীয়তা নিয়ে আসার বাস্তবিক কিছু নির্দেশনা ১৮৬

বৈশিষ্ট্য-১৮ : হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ১৯১
হিকমাহ্‌র সংজ্ঞা ১৯২
হিকমাহ্‌ বিকাশের উপকারিতা ১৯৩
হিকমাহ্‌সম্পন্ন মানুষদের কিছু আচরণ ও বৈশিষ্ট্য ১৯৩
হিকমাহ্‌ বা প্রজ্ঞার বিকাশে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ১৯৪

বৈশিষ্ট্য-১৯ : সবর (ধৈর্য) ১৯৭
সবরের গুণ অর্জন করতে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ২০৩

বৈশিষ্ট্য-২০ : সরলতা (Simplicity) ২০৫
সরলতার উপকারিতা ২০৮
সরলতাকে ব্যক্তিত্বের অংশ বানানোর কিছু নির্দেশনা ২০৯
কীভাবে কৃতজ্ঞতা চর্চা করবেন ২১১

বৈশিষ্ট্য-২০ : ভালোবাসা ২১৪
ভালোবাসার ধরনসমূহ ২১৭
ভালোবাসার বোধ শক্তিশালী করার বাস্তব কিছু নির্দেশনা ২২১

বৈশিষ্ট্য-২২ : সচেতনভাবে উপেক্ষা করা ২২৩
মহৎ ব্যক্তিদের জীবনে সচেতনভাবে উপেক্ষা করার উদাহরণ ২২৫
সচেতনভাবে উপেক্ষা করার গুরুত্ব ২২৭
কীভাবে উপেক্ষার দক্ষতা অর্জন করবেন ২৩১

বৈশিষ্ট্য-২৩ : আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-discipline) ২৩৪
আমরা কীভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলব? ২৩৪
আত্মনিয়ন্ত্রণের সংজ্ঞা ২৩৫
আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ২৩৮

বৈশিষ্ট্য-২৪ : লক্ষ্যভিত্তিক জীবনযাপন ২৪৩
লক্ষ্যের ওপর ফোকাস থাকা ২৪৪
লক্ষ্য নির্ধারণের পদ্ধতি ২৪৬
লক্ষ্যভিত্তিক জীবনযাপনের বাস্তবিক কিছু নির্দেশনা ২৪৯

বৈশিষ্ট্য-২৫ : বর্তমান মুহূর্ত উপভোগ করা ২৫০
বর্তমান মুহূর্ত উপভোগ করার উপকারিতা ২৫৫
বর্তমান মুহূর্ত উপভোগ করতে সহায়ক কিছু নির্দেশনা ২৫৫

বৈশিষ্ট্য-২৬ : উপকারী প্রভাব ২৫৮
মানুষের রেখে যাওয়া প্রভাব দুই প্রকার ২৬০
ক্ষতিকর প্রভাব ২৬০
উপকারী প্রভাব ২৬১
উপকারী প্রভাব রেখে যাওয়ার বাস্তবধর্মী কিছু নির্দেশনা ২৬৩

বৈশিষ্ট্য-২৭ : দুআ ২৬৬
দুআর তিনটি ধরন ২৭০
বাস্তব জীবনে কার্যকরভাবে দুআ চর্চা করার কিছু নির্দেশনা ২৭৩

সমাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি ২৭৭
১. সমাজের প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখা। ২৭৭
২. সমাজের মানুষের প্রতি ভালোবাসা। ২৭৯
৩. কল্যাণ কামনা করা। ২৮০
৪. সহায়তা করা। ২৮১
৫. কল্যাণকর নসিহত বা পরামর্শ দেওয়া। ২৮২
৬. উপকারের দুয়ার খোলা রাখা। ২৮৩
৭. মানুষকে সম্মান করা ও মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা। ২৮৩

৮. হাসিমুখে থাকা। ২৮৬
৯. বিরোধী বা দূরে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে ইতিবাচক যোগাযোগ। ২৮৮
১০. সমস্যা ও জটিলতার কথা শোনা। ২৮৯
১১. সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ। ২৮৯
আনন্দে অংশগ্রহণ ২৯০
দুঃখ ও কষ্টে সহমর্মিতা ২৯০
১২. অন্যের অনুভূতিকে ইতিবাচকভাবে বোঝার চেষ্টা করা। ২৯১
১৩. ইতিবাচক মূল্যায়ন। ২৯২
কেন ইতিবাচক মূল্যায়ন জরুরি? ২৯৩

ইতিবাচক ব্যক্তিত্বের সাত ভিত্তি ২৯৫
প্রথম ভিত্তি : ঝুঁকি নিতে সক্ষম হওয়া বা নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করা ২৯৫
দ্বিতীয় ভিত্তি : নিজের চাহিদা স্পষ্টভাবে বলা ২৯৬
তৃতীয় ভিত্তি : সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমারেখা নির্ধারণ করা ২৯৬
চতুর্থ ভিত্তি : প্রয়োজন হলে 'না' বলতে পারা ২৯৭
পঞ্চম ভিত্তি : অন্যদেরকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করার কৌশল ২৯৭
ষষ্ঠ ভিত্তি : অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার শিল্প ২৯৮
সপ্তম ভিত্তি : কথা বলার সময় চোখে চোখ রাখা ২৯৯

পজিটিভিটি ট্র্যাকার ৩০০
আপনার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচকতার মাত্রা জানুন ৩০০

ইতিবাচক চিন্তার পরিচয়

ইসলাম মানবজাতির জীবনে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যে চিন্তা-ভাবনা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে, তা প্রথমে নিজ অনুসারীদের অন্তর ও মানসিকতায় পরিবর্তন এনেছে। সেই পরিবর্তনের প্রভাব তাদের সমাজে পড়েছে, আর সমাজ বদলানোর মাধ্যমে বদলে গেছে গোটা দুনিয়ার চেহারাও।

বর্তমানে যখন মুসলিম উম্মাহ সামগ্রিকভাবে সব স্তরেই নিজেদের বাস্তব অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন বা অন্তত উন্নতি খুঁজছে, তখন অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আগত বহু জ্ঞান ও বিদ্যার আবির্ভাব ঘটেছে। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, এসব জ্ঞান কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

এসব জ্ঞানের মধ্যেই একটি ধারাকে 'পজিটিভ থিংকিং' বা ইতিবাচক চিন্তা নামে অভিহিত করা হয়। 'ইতিবাচকতা' হলো বিভিন্ন সমস্যা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা। এটি জীবন পরিচালনার একটি সমন্বিত পদ্ধতি।

এর মানে হলো, যেকোনো পরিস্থিতিতে নেতিবাচক দিকে না তাকিয়ে ইতিবাচক দিকগুলোর ওপর ফোকাস করা। আপনি নিজের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করবেন, অন্যদের মধ্যেও কল্যাণ দেখতে চেষ্টা করবেন এবং জীবনে সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করবেন।

ইতিবাচক চিন্তার পরিচয় দিতে গিয়ে 'ভেরা পিফার' (Vera Peiffer) বলেন, 'পজিটিভ থিংকিং হলো অবচেতন মন (Subconscious Mind) ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সক্ষমতাকে কাজে লাগানো।'[২]

---

২. Positive Thinking, p 12

ওয়াফা মুহাম্মাদ মুস্তফা বলেন, 'ইতিবাচক চিন্তার মানে হলো, আপনি আপনার অবচেতন মনের শক্তিকে ব্যবহার করবেন। তাহলে তা আপনার সামগ্রিক জীবনে এমনভাবে প্রভাব সৃষ্টি করবে, যা আপনাকে নিজ আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ও স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে।'[৩]

স্কট ডব্লিউ ভেন্ট্রেলা (Scott W. Ventrella) বলেন, 'এটি আমাদের সেই সহজাত ক্ষমতা, যেখানে ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে আমরা আরও উত্তম ফলাফলে পৌঁছতে পারি।'[৪]

সবশেষে বলা যায়, কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যার মুখোমুখি হলে খারাপ ও ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে ডুবে না গিয়ে সচেতনভাবে ভালো দিকগুলোর ওপর মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাসই হলো ইতিবাচক চিন্তা।

তবে এর অর্থ এই নয় যে বাস্তবতা বা সমস্যাকে অস্বীকার করতে হবে। বরং ইতিবাচক চিন্তার অর্থ হলো, বাস্তবতাকে স্বীকার করে হতাশায় না ভুগে গঠনমূলক ও আশাবাদী উপায়ে উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।[৫]

ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব

মানুষ যে বয়সেরই হোক, যে যুগেরই হোক, পৃথিবীর যে প্রান্তেই বসবাস করুক, স্বভাবতই সে চায় তার নিজের জীবন ও আশপাশের মানুষের জীবন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও ধারাবাহিক সাফল্যে ভরে উঠুক। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই সে চেষ্টা করে নিজের ও অন্যদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে। বস্তুগত ও মানসিক উভয় ধরনের উপকার নিশ্চিত করতে। একই সঙ্গে সে চায় ক্ষতি, কষ্ট ও অকল্যাণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে।

কিন্তু মানুষ কীভাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে?

এর একটি মৌলিক পথ হলো প্রথমেই নিজের চিন্তার মান উন্নত করা। অর্থাৎ আপনি যদি নিজের সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে ও সামগ্রিকভাবে জীবন সম্পর্কে

---

৩. হাক্বিক আহলামাকা বি কুওয়াতিত তাফকিরিল ইজাবিয়্যি, ২৯
৪. কুওয়াতুত তাফকিরিল ইজাবিয়্যি ফিল আমাল, ৪৯
৫. 'আত তাফকিরুল ইজাবিয়্যু ফি দওইস সুন্নাতিন নাবাউইয়্যাহ' নামক বই থেকে পরিমার্জিত।

সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতা গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সেটিই হবে পরিবর্তনের শুরু।

এর পাশাপাশি প্রয়োজন নিজেকে প্রশিক্ষিত করা, যেন আপনি নেতিবাচক চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে পারেন। কারণ নেগেটিভ চিন্তাগুলোই অনেক সময় আপনার সক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়, আপনার এনার্জি নষ্ট করে ফেলে এবং জীবনের লক্ষ্য অর্জনের পথে অদৃশ্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মানুষের একটি বড় শক্তি হলো, সে নিজের চিন্তার ধরন নির্বাচন করতে পারে। আপনি কীভাবে চিন্তা করবেন, তা চাইলে নিজেই ঠিক করতে পারেন। যদি আপনি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে নিজের ভেতরের অনেক অপ্রত্যাশিত ও অপ্রয়োজনীয় ইমোশন দূর করতে পারবেন, যেগুলো আপনাকে সর্বোত্তম অবস্থানে পৌঁছতে বাধা দেয়।

ইতিবাচক মানসিক প্রবণতা (Positive Mental Attitude) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এটি কেবল একটি ভাবধারা নয়, বরং এমন একটি অভ্যন্তরীণ শক্তি, যা আপনার পুরো জীবনধারাকে প্রভাবিত করতে পারে।

মানুষ যদি তার সচেতন মন (Conscious Mind) ও অবচেতন মন (Subconscious Mind)-এর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে, তাহলে সে তার পুরো জীবনকে বদলে দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

যখন মানুষের চিন্তা সঠিক পথে পরিচালিত হয়, যখন সে সত্যকে বুঝতে শেখে, যখন তার অবচেতন মনের ভান্ডারে জমা থাকা চিন্তাগুলো গঠনমূলক, পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকে, তখন এক বিস্ময়কর কার্যকর শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই শক্তি এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ তৈরি করে, যা মানুষের জন্য বিপুল উপকার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তম ফল বয়ে আনে।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য হলো, আপনি যদি বাইরের পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চান, তাহলে আগে ভেতরের কারণ পরিবর্তন করতে হবে। সেই কারণটা কী?

ইতিবাচকতার তিন শক্তি

মূলত তিনটি ভিত্তি-শক্তিই ইতিবাচক মাইন্ডসেটকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিন শক্তি থেকেই ইতিবাচক আচরণ, ইতিবাচক চিন্তা ও ইতিবাচক কাজের জন্ম নেয়। কারও মাঝে এর কোনোটিতে ঘাটতি থাকলে নেতিবাচকতা তাকে ঘিরে ফেলতে পারে।

এই তিনটির কোনো একটি যদি অনুপস্থিত থাকে, তবে সমন্বয় হারিয়ে যায়, ভারসাম্য নষ্ট হয়, মানুষ হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ডুবে যায়। এ ছাড়াও সে তিনটি বড় ভুলের ফাঁদে পড়তে পারে :

১. অপরকে দোষারোপ করা।
২. অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা।
৩. ভাগ্যকে দায়ী করা।

এ পর্যায়ে এসে তার ফোকাস ও চিন্তা নেতিবাচক হয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত নেতিবাচক অনুভূতি ও নেতিবাচক বাস্তবতার দিকে ঠেলে দেয়।

বাস্তবে অধিকাংশ মানুষ নিজ চিন্তা, ফোকাস ও আচরণ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। চাই সে এই ব্যাপারে সচেতন হোক কিংবা অচেতন। মূলত যেকোনো

নির্বাচনই একটি সিদ্ধান্তের ফলাফল। প্রতিটি নির্বাচনই একটি সিদ্ধান্ত, আর প্রতিটি সিদ্ধান্তই মানুষের নিজের হাতের সৃষ্টি। কিন্তু মূল চ্যালেঞ্জ হলো, আপনি কি সেই সিদ্ধান্তের দায় নিতে প্রস্তুত? অনেক সময় মানুষ বুঝতে পারে সে দুঃখী, কিন্তু স্বীকার করে না যে, এই দুঃখ তার নিজের চিন্তা ও নির্বাচনের ফল। তখন সে এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলোর দায় নেয় না এবং উপরিউক্ত তিনটি ভুলের ফাঁদে পড়ে যায়—অপরকে দোষারোপ করা, অন্যের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করা ও ভাগ্যকে দায়ী করা।

১. সিদ্ধান্ত

> ‘আপনার বর্তমান গতকালের সিদ্ধান্তের ফসল। আর আগামীকাল আজকের সিদ্ধান্তেরই প্রতিফল।’
>
> —ড. ইবরাহিম আল ফিকহি

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন :

- আপনি কি নিজের কাজ বা পেশাগত জীবনে সুখী?
- আপনার পারিবারিক জীবন কেমন চলছে, আপনি কি তা নিয়ে সন্তুষ্ট?
- আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?
- আপনার স্বাস্থ্য কেমন? আপনি কি নিজ ওজন বা শারীরিক অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট?
- ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কেমন আছেন?
- আপনি কি মনে করেন আপনার জীবনে উন্নতি ঘটেছে, না-কি না?
- আপনার আর্থিক অবস্থার প্রতি আপনি কি সন্তুষ্ট?

এই সব প্রশ্নের উত্তর মূলত আপনার অতীতের সিদ্ধান্তের ফলাফল। আপনি তা বুঝুন বা না বুঝুন, এই সিদ্ধান্তগুলোই আজ আপনার অবস্থা ও জীবনের ফলাফল তৈরি করেছে।

আমাদের পক্ষে সবসময় বাইরের পরিস্থিতি বা আমাদের ওপর আপতিত প্রভাবগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তবে আমরা ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নিতে

পারি যে, এই চ্যালেঞ্জগুলো কীভাবে মোকাবিলা করব। আপনি চাইলে সমস্যার সমাধানের দিকে ফোকাস করবেন, অথবা শুধু সমালোচনা, দোষারোপ ও রাগের দিকে মন দেবেন। যেকোনো সিদ্ধান্তই আপনার হাতে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى.

> ‘আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়।’ [সুরা নাজম, আয়াত ৩৯]

সিদ্ধান্তের মৌলিক পাঁচটি ধরন আছে

এক. চিন্তা-ভাবনার সিদ্ধান্ত।

জ্যাক ক্যানফিল্ড ও জ্যানেট সুইজার তাদের The Success Principles গ্রন্থে লিখেছেন, একজন মানুষ প্রতিদিন প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি চিন্তা গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব চিন্তার কোনো মানে বা প্রভাব তখনই আসে, যখন সে নিজে ঠিক করে যে, সে কোন দিকে এগোবে।

আপনি যদি আপনার চিন্তার দিকটি নেতিবাচকভাবে নির্বাচন করেন, ফলাফলও নেতিবাচক হবে। আর যদি আপনি ইতিবাচকভাবে চিন্তা করার সিদ্ধান্ত নেন, ফলাফল ইতিবাচক হবে।

অবচেতন মনের (Subconscious Mind) নিয়ম অনুযায়ী, মনের এই দিকটি প্রক্রিয়াগতভাবে নির্দিষ্ট চিন্তাকে নিজ থেকে বিস্তার করে এবং পাশাপাশি একই ধরনের আরও চিন্তাকে আকর্ষণ করে। এজন্য আপনার নিজের চিন্তাগুলো পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি যে চিন্তাগুলো মনের মধ্যে রাখবেন, তা কি সত্যিই মূল্যবান ও ব্যবহারযোগ্য, না-কি তেমন নয়। ঠিক যেভাবে আপনি আপনার শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাবার বেছে নেন, তেমনি আপনার মনের খাবার হলো চিন্তা। তাই সেই চিন্তাটা যেন হয় স্বাস্থ্যকর।

চিন্তার সিদ্ধান্তকে ইতিবাচক বানাতে হলে প্রথমে আপনাকে আপনার চিন্তাগুলোকে সচেতনভাবে বুঝতে হবে এবং তারপর সমাধান খুঁজতে হবে। এভাবে অবচেতন মনের নিয়ম আপনার পক্ষে কাজ করবে। এই প্রক্রিয়াটি

বারবার অনুশীলন করলে আপনি আপনার মস্তিষ্ককে শেখাতে পারবেন, কীভাবে চিন্তা বেছে নিতে হয় ও কার্যকর সমাধান খুঁজতে হয়।

দুই. ফোকাসের সিদ্ধান্ত।

ফোকাসের নিয়ম অবচেতন মনের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর নিয়মগুলোর একটি। কারণ আপনি যেকোনো বিষয়ে যতটা মনোযোগ দেন, মস্তিষ্ক সেটিকে সরলীকরণ (Generalize) করে এবং অন্য সব তথ্যকে আপাতদৃষ্টিতে উপেক্ষা করে। যাতে আপনি সেই বিষয়টির প্রতি পুরোপুরি ফোকাস করতে পারেন।

যদি আপনার ফোকাস ব্যর্থতার দিকে থাকে, তবে মস্তিষ্ক অন্য সব তথ্য বাদ দিয়ে ব্যর্থতাকেই গুরুত্ব দেয়, সেটিকে শক্তিশালী করে এবং এমনভাবে উপস্থাপন করে, যাতে আপনি সেই ব্যর্থতাকে মেনে নেন। ঠিক একইভাবে ইতিবাচক চিন্তার ক্ষেত্রে যদি আপনি সুখের দিকে মনোযোগ দেন, মস্তিষ্ক দুঃখের তথ্যগুলো বাদ দিয়ে সুখকে জেনারেলাইজড করে।

এই কারণে আপনাকে সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি আপনার মনোযোগ ও ফোকাস কোথায় ব্যয় করবেন। ফোকাসের শক্তিকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে, আপনি কোন বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন। তারপর সেই মনোযোগকে সমাধান ও বিকল্পের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এভাবে আপনি একসাথে অবচেতন মনের নিয়ম ও ফোকাসের নিয়ম দুটোই আপনার পক্ষে কাজে লাগাতে পারবেন।

তিন. অনুভূতির সিদ্ধান্ত।

মানবজীবনের জন্য অনুভূতি হলো জ্বালানির মতো। ইতিবাচক অনুভূতি শক্তি প্রদান করে, বিপরীতে নেতিবাচক অনুভূতি মানুষের ক্ষতি করতে পারে; মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই প্রথমে আপনার নিজের অনুভূতিগুলো লক্ষ করুন। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি মনোযোগ দিন, গভীর ও শান্তভাবে কয়েকবার শ্বাস নিন। প্রতিবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় মনে মনে বলুন, 'আলহামদুলিল্লাহ।'

এভাবে আপনি মস্তিষ্ককে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করছেন এবং আপনার শক্তি, মনোবল ও আত্মার শক্তিকেও পুনরুজ্জীবিত করছেন। এরপর আপনার মনোযোগকে সমাধান ও কার্যকর পদক্ষেপের দিকে কেন্দ্রীভূত করুন।

চার. আচরণের সিদ্ধান্ত।

মানসিক চক্র (Mental Cycle) মূলত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শুরু হয় অনুভব থেকে। অনুভব বা সচেতনতার মাধ্যমে মানুষ বিষয়গুলো উপলব্ধি করে। এই উপলব্ধি চিন্তাভাবনার জন্ম দেয়, চিন্তাভাবনা আবার বিষয়টির অর্থ বোঝায়। এরপর সেই অর্থের ওপর ফোকাস জন্মায়, ফোকাস অনুভূতি সৃষ্টি করে আর অনুভূতিই অবশেষে আচরণকে নির্দেশ দেয়।

যদি আপনি আচরণের মূল অর্থাৎ উপলব্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তবে এই পুরো মানসিক চক্র আপনার পক্ষে কাজ করবে। তখন চিন্তা, ফোকাস ও অনুভূতিগুলো ইতিবাচক হবে আর সেই ইতিবাচকতা আপনার আচরণে প্রতিফলিত হবে।

পাঁচ. ফলাফল মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত।

মানসিক চক্রই শেষ পর্যন্ত সেই ফলাফল তৈরি করে, যা আপনি পান। যদি দেখেন যে ফলাফল আপনার প্রত্যাশার সঙ্গে মিলছে না, তবে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করুন, যা প্রয়োজন তা সংশোধন করুন, ফলাফল থেকে শিক্ষা নিন এবং নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করুন। মনে রাখবেন, জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে সফলতা বা ব্যর্থতা হলো ফলাফলমাত্র। এগুলো মূল্যায়নযোগ্য, পরিবর্তনযোগ্য ও ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আপনি নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।

বৈশিষ্ট্য-১
তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা)

> ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।’
>
> [সুরা তালাক, আয়াত ৩]

আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা এবং তার ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা হলো ইতিবাচকতার দরজা খোলার, উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার ও অর্থবহ ছাপ রেখে যাওয়ার অন্যতম চাবিকাঠি।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা কেবল মুখে বলা, স্লোগান দেওয়া বা দাবি করার বিষয় নয়। আপনি যদি জীবনে সত্যিই ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চান, তবে তাওয়াক্কুলকে বাস্তব জীবনে নিয়মিত চর্চায় রূপ দিতে হবে। নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে অহেতুক লড়াই, অসন্তোষ বা আপত্তি করা থেকে নিজেকে থামানো, এই বিষয়গুলোকে অভ্যাসে পরিণত করা জরুরি।

যে ব্যক্তি তাওয়াক্কুল অবলম্বন করে, তার জন্য পথ সহজ হয়। সে জীবনের চেষ্টায় ক্লান্ত হয় না, বরং তৃপ্তি পায়। কারণ তার ভেতরে থাকে দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস থেকেই আসে শক্তি, সহায়তা, মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী হতে চায়, সে যেন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে। যে ব্যক্তি সবচেয়ে ধনী হতে চায়, সে যেন নিজের হাতে থাকা বস্তুর চেয়ে আল্লাহর হাতে যা আছে তার ওপর বেশি

ভরসা করে। আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে সম্মানিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।'[২৮]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দা যখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তখন তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেন, তার বোঝা হালকা করে দেন এবং তার অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন। ফলে সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে এবং তার তাকদিরকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করে।'

মানসিকভাবেও তাওয়াক্কুল মানুষের আত্মার তৃষ্ণা মেটায়। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা, তার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জানানো, আশা রাখা, দুআ করা ও তার নৈকট্য পাওয়া, এগুলো মানুষের অন্তরের মৌলিক চাহিদা। যখন এই আত্মিক চাহিদাগুলো পূরণ হয়, তখন মুমিনের ভেতর ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমেই সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুঁজে পায় এবং দুনিয়ার পথে আল্লাহর সাহায্য ও প্রশান্তি নিয়ে এগিয়ে চলে।

আল্লাহর ওপর ভরসাকারী মুমিনের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রত্যাশা সবসময়ই সুন্দর থাকে। জীবন সহজ হোক কিংবা কঠিন, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য থাকুক কিংবা কষ্ট, সব অবস্থাতেই সে ইতিবাচক থাকে এবং পরম সন্তুষ্টির সাথে পথ চলে।

তাওয়াক্কুল মানুষের মানসিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। এটি অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, নেতিবাচক ওভারথিংকিং, ভয়, উদ্বেগ, চাপ ও অস্থিরতা দূর করতে সাহায্য করে। এই সমস্যাগুলো দীর্ঘদিন চলতে থাকলে ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে, এমনকি মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতাও দেখা দিতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

> 'তুমি যখন সিদ্ধান্ত নেবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।' [সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯]

এ আয়াতের মাধ্যমে আপনার রব আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছেন পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাওয়াক্কুলকে অভ্যাসে পরিণত করতে, ভেতরের শান্তি অর্জন করতে এবং যেকোনো ঘটনার অপ্রয়োজনীয় মানসিক সংঘর্ষ থেকে মুক্ত থাকতে।

---

২৮. আমরাজুল কুলুব ওয়া শিফাউহা, পৃষ্ঠা ৫১

বৈশিষ্ট-৪
ইতিবাচক চিন্তা (Positive Thinking)

> ‘মানুষ যেভাবে চিন্তা করে, সেভাবেই বেড়ে ওঠে।’
>
> —জেমস অ্যালেন

বিজ্ঞানীরা বলেন, ভাইরাস যে ধরনেরই হোক, তার কাজ মূলত তিনটি। প্রথমত, ভাইরাস ক্রমাগত বিভাজিত হয় এবং সংখ্যা বাড়াতে থাকে। দ্বিতীয়ত, ভাইরাস যেখানেই থাকুক, তা ক্ষতি করে। তৃতীয়ত, ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক একইভাবে নেতিবাচক চিন্তাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের মনের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো মানুষের অনুভূতি ও আবেগ নষ্ট করে, ভুল আচরণের জন্ম দেয়। বারবার ঘটতে থাকলে এই চিন্তাগুলো ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে যায়। এর ফল হিসেবে মানুষ ঢুকে পড়ে নেতিবাচকতা, অভিযোগ, তুলনা, অসন্তুষ্টি আর নিজেকে ভুক্তভোগী ভাবার ভূমিকায়। নেতিবাচক চিন্তা আমাদের জীবনে একের পর এক সমস্যা, অস্বস্তিকর অনুভূতি, ভুল আচরণ ও খারাপ ফলাফল ডেকে আনে। এটি মানুষকে গঠন, অগ্রগতি ও উন্নয়ন থেকে বিরত রাখে এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তির অপচয় ঘটায়।

গবেষণায় দেখা গেছে, নেতিবাচক চিন্তা আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং বহু মানসিক ও শারীরিক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নেতিবাচক চিন্তা অনেকটা সাপের দংশনের মতো। দংশনের কারণে মানুষ মারা যায় না, মারা যায় বিষের কারণে। ঠিক তেমনি একটি নেতিবাচক চিন্তাকে ভয়ংকর করে তোলে তার পুনরাবৃত্তি।

নেতিবাচক চিন্তার লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- ➥ সবকিছুতে হতাশা দেখা।
- ➥ পরিস্থিতিকে অতিরঞ্জিতভাবে মূল্যায়ন করা।
- ➥ অতীতের কষ্টকর ঘটনা বারবার মনে করা।
- ➥ আমি অক্ষম, আমি অলস, আমি পারি না, আমাকে কেউ ভালোবাসে না, এই ধরনের বাক্য নিজের সম্পর্কে বারবার পুনরাবৃত্তি করা।
- ➥ নিজেকে অতিরিক্ত সরলীকরণ করা। যেমন : আমার চিন্তায় জড়তা আছে, আমার মত পরিবর্তনে অক্ষমতা আছে, আমি সবসময় বিপদের আশঙ্কা করি ইত্যাদি।

মুস্তফা মাহমুদ বলেন, 'জীবনের পথে আমরা ঠিক সেটাই পাই, যেটা আমরা প্রত্যাশা করি।'

কিছু গবেষণা আরও জানায়, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার মূল কারণ কঠিন পরিস্থিতি নয়। বরং সমস্যাকে মানুষ যেভাবে ব্যাখ্যা করে বা দেখে, সেটাই আসল কারণ। এপিকটেটাস বলেন, 'মানুষ বিভিন্ন ঘটনার কারণে অশান্ত হয় না, বরং নিজ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অশান্ত হয়।'

গবেষকরা বলেন, অনুমানভিত্তিক চিন্তা, অযৌক্তিক জেনারেলাইজেশন, বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত আদর্শবাদ, ভয়, হতাশা, অন্ধকার দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিটি ঘটনাকে নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা ইত্যাদির সঙ্গে বিষণ্ণ মনের সরাসরি সম্পর্ক আছে।

এখান থেকে বোঝা যায়, মানুষের ইতিবাচকতা ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে নিজ চিন্তা ও অনুভূতির ওপর। যদি চিন্তা ও অনুভূতি আনন্দময় ও ইতিবাচক হয়, মানুষ তখন সুখী থাকে এবং ভালো কাজ ও ভালো অর্জনের পথে এগিয়ে যায়। আর যদি চিন্তা ও অনুভূতি নেতিবাচক হয়, তাহলে মানুষ দুঃখী ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা একমত যে, কঠিন পরিস্থিতিতেও আশাবাদী থাকা ও ইতিবাচক চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরি। ডেল কার্নেগি বলেন, 'আমি আবিষ্কার করেছি, যেসব বিষয়ে আমরা দুশ্চিন্তা করি, তার প্রায় ৯০ শতাংশই কখনো ঘটে না।'

বৈশিষ্ট্য-২০
ভালোবাসা

> ‘ভালোবাসার সবচেয়ে সুন্দর দিক হলো, ভালোবাসা মানুষকে আরও মার্জিত ও আকর্ষণীয় করে তোলে।’
>
> —নিকোলা টেসলা

নিজের প্রতি, জীবনের প্রতি ও অন্যদের প্রতি মানুষের যে গভীর ভালোবাসা থাকে, সেটাই তাকে ইতিবাচকতার পথে এগিয়ে যাওয়ার এক প্রবহমান পথ তৈরি করে দেয়। তাই নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনার ভেতরে কি ভালোবাসা নতুন করে জন্ম নেয়? আপনি কি পৃথিবীকে ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখেন?

ভালোবাসা কেবল কিছু আবেগের সমষ্টি নয়; বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা প্রতিনিয়ত গড়ে তুলতে হয় এবং লালন করতে হয়। ভালোবাসা একটি মহান মূল্যবোধ, একটি দক্ষতা ও একটি শিল্প, যাকে আমরা সচেতনভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারি।

ভালোবাসা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ ভালোবাসার প্রয়োজন অনুভব করে। এমন কোনো শিশুর কথা চিন্তা করুন, যে ভালোবাসা পায়নি, তার ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, ভেবে দেখুন। এমন কোনো বন্ধুত্বের দিকে তাকান, যেখানে ভালোবাসার অভাব রয়েছে, তার পরিণতি কী হয়, লক্ষ করুন। এমন কোনো পরিবারের কথা ভাবুন, যেখানে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক নেই, সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। আবার নিজের ঈমানের দিকেও

তাকান, আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি খাঁটি ভালোবাসা না থাকলে সেই ঈমান কতটা জীবন্ত থাকতে পারে, ভাবুন।

ভালোবাসাই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ভালোবাসা থেকেই আমাদের সৃষ্টি, ভালোবাসার মাধ্যমেই আমরা বিশ্বাস করি, বাঁচার শক্তি পাই ও সামনের দিকে এগিয়ে চলি।

মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম (Erich Fromm) তার বিখ্যাত গ্রন্থ The Art of Loveing-এ ভালোবাসার গভীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই বইটি ভালোবাসা বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত। তিনি বলেন, 'ভালোবাসা কোনো অনুভূতি নয়, বরং একটি সক্রিয় কর্ম। ভালোবাসা মানে পড়ে যাওয়া নয়, দাঁড়িয়ে থাকা। ভালোবাসা হলো নিঃশর্ত দান, কেবল প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ নয়।'

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে, অন্যদের প্রতি ঘৃণা মানুষের নিজের ভেতরের অবস্থারই প্রতিফলন। মানুষের মনে যে বিদ্বেষ ও নেতিবাচক আবেগ জমে থাকে, সেটাই আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজের কিছু গুণ বা আচরণ অপছন্দ করে, পরে সেই অপছন্দগুলো সমাজ ও অন্য মানুষের ওপর আরোপ করে দেয়। এভাবেই ঘৃণা ও বিদ্বেষের জন্ম হয়। এখান থেকেই ব্যক্তি, দম্পতি কিংবা বন্ধুদের মধ্যে ঘৃণার বিস্তার ঘটে। এর পেছনে থাকতে পারে হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকার মানসিকতা।

অনেক সময় সন্তানদের মধ্যে সমতা না থাকলে ভাইবোনদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। অতিরিক্ত ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা ও কঠোর আচরণও ঘৃণার কারণ হতে পারে। কখনো অন্যের বিশ্বাস, মতাদর্শ কিংবা কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণেও এই অনুভূতি জন্ম নেয়। অনেক ক্ষেত্রে পূর্বধারণা বা ভুল বিচার থেকেও ঘৃণা তৈরি হয়। কখনো কেবল একটি ধারণার ভিত্তিতে কাউকে নেতিবাচকভাবে বিচার করে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মহান বাণীটি স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই ভালোবাসে, যা সে নিজের জন্য ভালোবাসে।'[৬৪]

৬৪. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৩

বৈশিষ্ট্য-২৪
লক্ষ্যভিত্তিক জীবনযাপন

> ‘জীবন এক বিস্তৃত সমুদ্র, দিগন্তবিস্তৃত ও গভীর। আমাদের জীবন জাহাজের মতো। প্রতিটি জাহাজেরই একজন নাবিক থাকে। আপনার জীবন-জাহাজের নাবিক আপনি নিজেই। যদি নাবিকের হাতে মানচিত্র ও দিকনির্দেশক কম্পাস না থাকে, তাহলে কোনো নৌকা তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। আর যদি আগে থেকে নির্দিষ্ট গন্তব্য ঠিক না থাকে, তাহলে তো সেখানে পৌঁছার প্রশ্নই ওঠে না।’

—কারিম শাজেলি

লক্ষ্যভিত্তিক জীবন ইতিবাচক মাইন্ডসেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সবার লাইফের একটা পারপাস থাকা দরকার। এই পারপাস না থাকলে জীবন নেতিবাচকতায় ভরে যায়। যাদের জীবনে মহৎ কোনো লক্ষ্য নেই, তারা সবসময় নেতিবাচকতায় হাবুডুবু খায়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে নিজের জীবন ও আশেপাশের মানুষের জীবনকে নেতিবাচক করে তোলে। সবসময় ছোটখাটো ইস্যু ও ঝগড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

১৯৫৩ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে গবেষকরা একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। সেখানে তারা দেখতে পান, মাত্র ৩% স্নাতক স্টুডেন্টের কাছে সুস্পষ্ট ও লিখিত লক্ষ্য ছিল। বাকি অনেকে কোনো লক্ষ্যই ঠিক করেনি, আবার অনেকের লক্ষ্য ছিল অস্পষ্ট, ধোঁয়াশাপূর্ণ ও নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনাহীন।

সমাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি

মানুষ সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলতেই হয়। কখনো সেই সম্পর্ক হয় হৃদ্যতাপূর্ণ, আবার কখনো তিক্ততায় পরিপূর্ণ। হাদিসে নববিতে এমন অনেক বর্ণনা রয়েছে, যা সমাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির পথ দেখায় এবং দৈনন্দিন জীবনে এর চর্চাকে সুদৃঢ় করে। নিম্নে হাদিসে নববির আলোকে সমাজের প্রতি ইতিবাচকতা চর্চার কিছু বাস্তবিক নির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

১. সমাজের প্রতি ইতিবাচক ধারণা রাখা।

একটি হাদিস দিয়ে এ বিষয়টি শুরু করি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন সেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত।'[৮০]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি সবসময় মানুষের দোষ ধরে, খারাপ দিক উল্লেখ করে, তাহলে সেই প্রকৃতপক্ষে তাদের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ তার নিজের গুনাহ তো আছেই, পাশাপাশি অন্যদের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করার গুনাহও তার ওপর বর্তায়। এমনকি তা কখনো তাকে আত্ম-অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। সে নিজেকে তাদের চেয়ে উত্তম মনে করতে শুরু করে।[৮১]

---

৮০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬২৩

৮১. আলামুল হাদিস, ৪/১২০

দুনিয়াকে দেখার দুটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

আপনি চাইলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন। তাহলে একজন ইতিবাচক মানুষ হয়ে উঠবেন। দুনিয়াকে কল্যাণ ও সদাচারের আলোকে দেখবেন, নিজের ব্যাপারে আরও আশাবাদী হবেন, আরও সুখী ও আরও কার্যকর হয়ে উঠবেন।

বিপরীতে আপনি যদি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন, তাহলে পৃথিবীর দিকে তাকালে সর্বত্র কেবল সমস্যা ও অবিচারই দেখতে পাবেন। সুযোগ ও আশার পরিবর্তে আপনার চোখে ধরা পড়বে সীমাবদ্ধতা ও বঞ্চনা।

যখন চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সে নিঃসন্দেহে সমাজের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের সাথে মেশে, তাদের কল্যাণে উপদেশ দেয় এবং এ পথে যে কষ্ট বা আঘাত আসে, তার ওপর ধৈর্যধারণ করে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ইতিবাচক অর্থটিকে আরও সুদৃঢ় করেছেন একজন নবির ঘটনা উল্লেখ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি একজন নবিকে দেখতে পাচ্ছি, যাকে তার সম্প্রদায় প্রহার করেছে এবং রক্তাক্ত করেছে। অথচ তিনি মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন, তারা তো জানে না।'[৮২]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি রহিমাহুল্লাহ বলেন, এতে প্রকাশ পায় নবিগণের ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি মমতা কত গভীর ছিল। তারা তাদের জন্য হেদায়েত ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং তাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করার পেছনে অজ্ঞতাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করতেন।[৮৩]

---

৮২. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩২৯০

৮৩. শরহুন নববি আলা সহিহিল মুসলিম, ১২/১৫০

পজিটিভিটি ট্র্যাকার

আপনার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচকতার মাত্রা জানুন

নিম্নে কয়েকটি প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর সততার সঙ্গে দিলে আপনি নিজের ব্যক্তিত্বে ইতিবাচকতার স্তর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। মোট ৩০টি প্রশ্ন রয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি উত্তর নির্বাচন করবেন।

উত্তর দেওয়ার সময় নিজেকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতা নিয়ে উত্তর দিন, যাতে আপনি নিজেকে আরও উন্নত করতে পারেন।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের ধরন হবে নিম্নরূপ :

- ✓ প্রায়ই।
- ✓ মাঝে মাঝে।
- ✓ কখনোই না।

প্রশ্নসমূহ :

১. আমি কি নিজ দায়িত্ব ও কাজগুলোতে সফল হওয়ার প্রত্যাশা রাখি?

২. আমি কি নিজেকে উপযুক্ত, মূল্যবান ও সক্ষম মনে করি?

৩. আমি কি আমার সক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেগুলো উন্নত করার চেষ্টা করি?